মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি কর
খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত কর

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১০

২১-২৭ জুলাই ২০১০

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১০ উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড়পত্র ২১ জুলাই ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ / ৬ শ্রাবণ ১৪১৭ বঙ্গাব্দ

মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।
০৬ শ্রাবণ ১৪১৭
২১ জুলাই ২০১০

বাণী

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১০ উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য খাতের অবদান অপরিসীম। আবহমান কাল থেকে আমাদের জনগণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য দূরীকরণে এ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের মৎস্য সম্পদের উন্নয়নে প্রাকৃতিক জলাশয়ের সংরক্ষণ, মাছের বংশবিস্তার এবং পরিকল্পিত উপায়ে মৎস্য চাষ অপরিহার্য। খাদ্য নিরাপত্তার কথা বিবেচনায় রেখে এ বছরের জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের প্রতিপাদ্য "মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি কর, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত কর" অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। আমি মৎস্য খাতের উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১০ উপলক্ষে আমি মৎস্যজীবী, মৎস্যচাষী ও এ খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাই এবং মৎস্য সপ্তাহ ২০১০ এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

খাদ্য নিরাপত্তায় মৎস্য সেক্টরে প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন সম্ভাবনা

মোঃ মজিবুর রহমান
মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য উপখাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময়। জাতীয় অর্থনীতিতে এ সম্ভাবনাময় সেক্টরের ভূমিকা ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। মোট দেশজ উৎপাদনের ৩.৭৪ শতাংশ মৎস্য উপখাতের অবদান। দেশের মোট কৃষিজ আয়ের ২২.২৩ শতাংশ মৎস্য উপখাত থেকে আসে। গত ২০০৮-০৯ সালে মৎস্য উপখাতে গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৫.৪০ শতাংশ, তবে বিগত ১০ বছরের প্রবৃদ্ধি পর্যালোচনায় দেখা যায় এ উপখাতে ১০ শতাংশ পর্যন্ত বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি অর্জনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। দেশের রপ্তানি আয়ের ৩ শতাংশ আসে মৎস্য উপখাত থেকে। মোট দেশজ উৎপাদনে মৎস্য খাতের অবদানের চেয়েও জাতীয় অর্থনীতিতে এ খাতের অবদান বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০ শতাংশ যোগান দেয় মাছ এবং দেশের জনগোষ্ঠীর প্রায় ১০ শতাংশ এ সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে। মৎস্য অধিদপ্তর নিয়মিত ভাবে রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি)-র ২০১৫ সালের মধ্যে অর্জিতব্য নির্দিষ্ট আটটি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচন, পুষ্টি চাহিদা পূরণ, শিক্ষা ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা আনয়ন এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ন অন্যতম। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ সরকার দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে মৎস্য উপখাতকে দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দরিদ্রবান্ধব অর্থনৈতিক উন্নয়নে অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষ করে মাছচাষ সম্প্রসারণ ও মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদের জৈবিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার মাধ্যমে দরিদ্রবান্ধব অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।

মৎস্য সম্পদের উৎস ও মৎস্য উৎপাদন ঃ বাংলাদেশ জলসম্পদ ও প্রাণিবৈচিত্র্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে রয়েছে অসংখ্য নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর-দিঘি, ডোবা-নালা, হাওর-বাঁওড় ও প্লাবনভূমি। এছাড়াও রয়েছে বঙ্গোপসাগরের বিশাল জলরাশি। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের আয়তন ৪০.৪৭ লক্ষ হেক্টর (৮৮%) এবং অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ের আয়তন ৫.২৮ লক্ষ হেক্টর (১২%)। বিগত দশ বছরের উৎপাদন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ১৯৯৯-২০০০ বছরে মাছের মোট উৎপাদন ছিল ১৬.৬১ লক্ষ মে টন। ২০০৮-০৯ বছরে এই উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৭.০১ লক্ষ মে. টন, যা ভিত্তি বছরের উৎপাদনের চেয়ে ৬৩ শতাংশ বেশি। অধিকন্তু উন্নততর প্রযুক্তির উদ্ভাবনের সাথে সাথে মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত সম্প্রসারণ কর্মীগণের চাহিদাভিত্তিক ও সার্বক্ষণিক সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের ফলে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের মৎস্য উৎপাদন প্রবৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনায় উৎপাদন প্রক্ষেপণ ও মাছের চাহিদা ঃ ২০০৮-০৯ সালে দেশে মোট ২৭.০১ লক্ষ মে. টন মাছ ও চিংড়ি উৎপাদিত হয়েছে। চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে উৎপাদন বাড়াতে হলে অধিক হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। বিদ্যমান প্রবৃদ্ধির হার বাড়িয়ে ২০১০-১১ সালে ৩০.৮০ লক্ষ মে. টন, ২০১৪-১৫ সাল নাগাদ ৩৬.৬৬ লক্ষ মে. টন এবং ২০২০-২১ সাল নাগাদ ৪১.৩৯ লক্ষ মে. টন মাছ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাপ্ত প্রাণিজ আমিষের শতকরা ৬০ ভাগ আসে মাছ থেকে। এ আমিষ পেতে হলে আমাদের প্রতিদিন ৫৬ গ্রাম মাছ আবশ্যক। এ প্রেক্ষিতে আগামী ২০১৫ ও ২০২১ সালে দেশে মোট মাছের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে যথাক্রমে ৩৫.৪০ ও ৩৯.১০ লক্ষ মে টন।

মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের চ্যালেঞ্জসমূহ ঃ মাছের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটানো, অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নের ক্রমধারায় চিহ্নিত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ক. অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয় ঃ সরকারি বদ্ধ জলাশয়ের ব্যবহার অধিকার ও প্রাপ্যতা সম্পর্কে নীতিমালার অভাব, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনশক্তির অপর্যাপ্ততা, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের অপ্রতুলতা, ইত্যাদি সমস্যাসমূহ বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য সম্পদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের পথে বাধা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

খ. অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় ঃ মৎস্য মজুদ ও উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে কারিগরি জ্ঞানের অভাবে সর্বোচ্চ সহনশীল পর্যায়ে মৎস্য আহরণ কৌশল নিরূপণ করাসহ মুক্ত জলাশয়ের যথাযথ উৎপাদন প্রক্ষেপণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়হীন উন্নয়ন কার্যক্রম, শিল্পায়নের বর্জ্য দ্বারা জলাশয়ের পানি দূষণ, নদী বা সংযোগ খাল পলি দ্বারা ভরাট হয়ে যাওয়ার ফলে প্রাকৃতিকভাবে মাছের মজুদ ও বৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি, মৎস্য প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্রগুলো বিনষ্ট হওয়া ইত্যাদি সমস্যা মুক্ত জলাশয়ের সহনশীল মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

গ. উপকূলীয় চিংড়িচাষ ও ব্যবস্থাপনাঃ উপকূলীয় চিংড়িচাষের ক্ষেত্রে গুণগত মানসম্পন্ন চিংড়ি পোনার অভাব, মৌলিক অবকাঠামোর অভাবে নিবিড় ও আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে চিংড়িচাষ ব্যবস্থাপনা সমস্যা, উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশগত অবক্ষয়, চিংড়ির রোগবালাই, চিংড়িচাষে উচ্চ বিনিয়োগ খরচ, ভূমি ব্যবহারে আন্তঃখাত প্রতিযোগিতা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সমন্বিত নীতিমালার অভাব, খাদ্য নিরাপদ বিষয়ে চিংড়িচাষি ও ব্যবসায়ীদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন জনবলের অভাব ইত্যাদি সমস্যা উপকূলীয় এলাকায় চিংড়িচাষ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

ঘ. সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ঃ বাংলাদেশে বিশাল সামুদ্রিক জলজসম্পদ থাকা সত্ত্বেও দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের মাত্র ২২ শতাংশ আসে এক্ষেত্র থেকে। এজন্য যে সব বিষয়কে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো হলো মাছের মজুদ সম্পর্কে সীমিত তথ্য ও কারিগরি জ্ঞানের অভাব, উপকূলবর্তী এলাকায় অতিমাত্রায় মাছ ও চিংড়ি আহরণের ফলে মজুদের মারাত্মক ক্ষতিসাধন, অবৈধ জালের ব্যবহার, অপরিকল্পিতভাবে ডিমার্সেল ও পেলাজিক মাছের আহরণ, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র ও পরিবহনের অপ্রতুলতা ইত্যাদি। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে এসব চিহ্নিত সমস্যাদি ভবিষ্যৎ কর্মসূচি গ্রহণের কৌশল নির্ধারণে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

উন্নয়ন কৌশল ও কর্মসূচি

ক. অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ঃ দেশের বদ্ধ জলাশয়গুলো মাছ উৎপাদনের জন্য একটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। বিগত ১০ বছরের উৎপাদন ধারাবাহিকতায় দেখা যায়, ভিত্তি বছর (১৯৯০-০০) এর তুলনায় বদ্ধ জলাশয়ের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৬২ শতাংশ। অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ে উন্নত মৎস্যচাষ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বর্তমানের ৯.১৭ লক্ষ মে.টন থেকে ২০১৫ সালে ১২.৩৭ লক্ষ মে.টন এবং ২০২১ সালে ১৫.৫১ লক্ষ মে.টনে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

আর এ বর্ধিত উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কৌশল অবলম্বন করা হবেঃ

১. স্থানীয় মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মীর মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং মৎস্য সম্প্রসারণ সেবা ইউনিট ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃতকরণ;
২. মৎস্য/চিংড়িচাষ প্রদর্শনী খামার স্থাপনের মাধ্যমে উন্নততর চাষ পদ্ধতির প্রচলন;
৩. সরকারি বদ্ধ জলাশয়ের ব্যবহারের অধিকার ও প্রাপ্যতা সম্পর্কে নীতিমালা প্রণয়ন;
৪. ব্রুড মাছের জাত উন্নয়ন, জিনপুল প্রতিষ্ঠা ও গুণগতমানসম্পন্ন পোনার প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ;
৫. মঙ্গাকবলিত এলাকায় মৎস্যবিষয়ক কার্যক্রম জোরদারকরণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আপদকালীন জীবিকায়নের লক্ষ্যে খাদ্য সহায়তাসহ পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ;
৬. মৎস্য খাদ্য ও উপকরণের মান নিশ্চিতকরণ;
৭. মাছ ও চিংড়ির রোগ নিরাময় ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় কারিগরি সহায়তা প্রদান;
৮. মৎস্যচাষিদের জন্য সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ;
৯. গবেষণার মাধ্যমে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ;
১০. উৎপাদিত পণ্যের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংরক্ষণ ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
১১. মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
১২. ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা;
১৩. মৎস্যসম্পদ জরিপ কার্যক্রম জোরদারকরণ।

ক. অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ঃ ষাটের দশকে দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ৯০ শতাংশ আসতো উন্মুক্ত জলাশয় হতে, বর্তমানে যা ৩৫ শতাংশেরও নিচে নেমে গেছে। মৎস্য অধিদপ্তর অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমাজভিত্তিক জলাশয় ব্যবস্থাপনা, মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধার, মুক্ত জলাশয়ে পোনা মাছ অবমুক্তি, মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা, প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মাছচাষ, মৎস্য সংরক্ষণ আইনের যথাযথ প্রয়োগ ইত্যাদি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের সকল উৎস থেকে ২০১৫ সালে মাছের উৎপাদন ১৬.৯০ লক্ষ মে. টন এবং ২০২১ সালে ১৭.৬৪ লক্ষ মে.টনে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, প্রজনন এবং বংশবৃদ্ধির জন্য অভয়াশ্রম স্থাপন একটি অন্যতম কারিগরি কৌশল হিসেবে ইতোমধ্যেই সুফলভোগীদের নিকট পরিচিতি লাভ করেছে। এ দশকের প্রথম দিক থেকে অভয়াশ্রম পরিচালনার সাফল্য দেখা যাওয়ায় দেশব্যাপী বর্তমানে এর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫৬৬টি-তে। এসব অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে ঐসব জলাশয়ে মাছের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিভিন্ন বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতির বংশবৃদ্ধি ঘটেছে।

ইলিশ সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে জাটকা রক্ষা কর্মসূচিতে মৎস্য অধিদপ্তরের পাশাপাশি বাংলাদেশ নৌবাহিনী, কোস্ট গার্ড, স্থানীয় প্রসাশন, পুলিশ, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও নদী তীরবর্তী সুফলভোগীগণ অংশগ্রহণ করছে। এছাড়া দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ৪টি পয়েন্টকে ইলিশ অভয়াশ্রম এলাকা হিসেবে ঘোষণাসহ মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন, জাটকা জেলেদের পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। জলজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বর্ধিত উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কৌশল অবলম্বন করা হবেঃ

১. মাছের প্রাকৃতিক আবাসস্থল পুনরুদ্ধার ও অভয়াশ্রম স্থাপন কার্যক্রম জোরদারকরণ;
২. বর্তমানে চালু জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা পরিবর্তন/পরিমার্জন করে অভ্যন্তরীণ জলমহালে জৈবিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;
৩. সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও মৎস্যজীবীদের সমন্বয়ে দেশব্যাপী বিভিন্ন এলাকায় সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ;
৪. মৎস্যজীবী সম্প্রদায়কে দাদনদারদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আর্থিক/উপকরণ সহায়তা প্রদান এবং সংগঠিত করে পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ;
৫. খাস জলাশয়ে দরিদ্র মৎস্যজীবীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ। প্রবাহমান নদীর মৎস্য আহরণ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে মৎস্যজীবীদের অধিকারপত্র/লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
৬. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়হীন ও অপরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রম বন্ধ করার সাথে সাথে জলজ পরিবেশের অবক্ষয় ও দূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ;
৭. বিল নার্সারি কার্যক্রম গ্রহণ ও মুক্ত জলাশয়ে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ;
৮. মৎস্য সংরক্ষণ আইন সংশোধন এবং বাস্তবায়ন অধিকতর জোরদারকরণ;
৯. উপযুক্ততা নিরূপণ সাপেক্ষে ঘের, পেন ও খাঁচায় মাছচাষ সম্প্রসারণ;
১০. প্লাবনভূমিতে মাছচাষ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অর্জিত উত্তম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্প্রসারণ ও সম্পদ সংরক্ষণের জন্য গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা;
১১. মৎস্যজীবীদের জীবিকা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিকল্প কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ এবং জোরদারকরণ;
১২. ইলিশ মাছের অভিপ্রয়াণ ও মজুদ নিরূপণ সংক্রান্ত সমীক্ষা পরিচালনা। তাছাড়া উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য আহরণ ও মজুদ সংক্রান্ত ডেটাবেইজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে জরিপ কাজ পরিচালনা;
১৩. মৎস্য খাদ্য, মৎস্য হ্যাচারি, মৎস্য কোয়ারেন্টাইন এবং মৎস্য অভয়াশ্রম আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
১৪. আধা-লবণাক্ত জলাশয়ে মাছচাষ সম্প্রসারণ।

গ. উপকূলীয় চিংড়ি চাষ ও ব্যবস্থাপনাঃ চিংড়ি বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রধান রপ্তানি পণ্য। দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি খামারের সংখ্যাও দ্রুত গতিতে সম্প্রসারিত হচ্ছে। ফলে কয়েক বছরের ব্যবধানে চিংড়ি খামারের আয়তন ০.৬৪ লক্ষ হেক্টর হতে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১.৩৫ লক্ষ হেক্টরে উন্নীত হয়েছে। ২০০৮-০৯ সালে প্রায় ০.৭৩ লক্ষ মে টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে দেশ আয় করেছে প্রায় ৩২৭৪ কোটি টাকা। উপকূলীয় এলাকায় উন্নত চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে চিংড়ির উৎপাদন বর্তমানের ১.৪৯ লক্ষ মে টন থেকে ১.৭২ লক্ষ মে টনে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বর্ধিত চিংড়ি উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীতব্য কৌশলগুলো হলো :

১. চিংড়িচাষ এলাকা ঘোষণা ও চিংড়িচাষ এলাকার মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন;
২. পরিবেশবান্ধব চিংড়িচাষ সম্প্রসারণ ও চাষ নিবিড়করণ;
৩. চিংড়িচাষ ও ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে উত্তম চাষ পদ্ধতি ও উত্তম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রবর্তন;
৪. খাদ্য নিরাপদ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে হ্যাসাপ ও ট্রেসিবিলিটি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের মাঝে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি;
৫. সমুদ্র থেকে মা চিংড়ি সংগ্রহ কার্যক্রম উন্নয়ন;
৬. মোহনা ও উপকূলীয় এলাকায় কিশোর চিংড়ি আহরণ নিষিদ্ধকরণ;
৭. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ঘন ঘন দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষার লক্ষ্যে গণসচেতনতা সৃষ্টি;
৮. সুন্দরবন এলাকার মৎস্য নার্সারি ও প্রজননক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সংরক্ষণ;
৯. গবেষণার মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ;
১০. উপকূলীয় এলাকার জনগণকে চিংড়ি চাষ উন্নয়ন কর্মকান্ডে জড়িত করাসহ সম্প্রসারণ ও সম্পদ সংরক্ষণের জন্য গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা।

ঘ. সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদঃ বাংলাদেশের বিশাল সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে সরকার কর্তৃক ট্রাস ফিস সমুদ্রে নিক্ষেপ নিয়ন্ত্রিত করার ফলে প্রতিটি মাছ ধরার ট্রলার হতে প্রায় ৩০ শতাংশ সাদা মাছ বেশি আহরিত হচ্ছে। ইতোমধ্যেই মৎস্য অধিদপ্তর প্রকল্পের মাধ্যমে সামুদ্রিক এবং উপকূলীয় মৎস্য সম্পদ জরিপ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। একই সাথে সরকার বঙ্গোপসাগরের মিডল গ্রাউন্ড ও সাউথ প্যাচেস-এর নিকটবর্তী ৬৯৮ বর্গকিলোমিটার এলাকাকে সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ থেকে বর্ধিত মাছ/চিংড়ি আহরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কৌশল অবলম্বন করা হবে :

১. জরিপের মাধ্যমে পেলাজিক এবং ডিমার্সেল মাছের মজুদ নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রণয়ন;
২. যান্ত্রিক নৌযানে কর্মরত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি;
৩. সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মনিটরিং, কন্ট্রোল ও সার্ভেল্যান্স বা এমসিএস কৌশল প্রবর্তন;
৪. উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের স্থায়িত্বশীল জীবিকায়নের সুযোগ সৃষ্টি;
৫. আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন মৎস্য অবতরণকেন্দ্র স্থাপন এবং নিরাপদ ও সহজ পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
৬. জলযান নিবন্ধন ও মাছ ধরার অনুমতি প্রদানে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ;
৭. সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে যুগোপযোগী ব্যবস্থাপনা নীতির প্রবর্তন।

উপসংহার

বিগত দিনগুলোতে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগ সার্থকতা এবং উৎপাদন প্রবৃদ্ধির গতিধারার আলোকে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অধিক অংশগ্রহণ এখন সময়ের দাবি। অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয় ও উপকূলীয় এলাকার আধা-লবণাক্ত জলাশয়ের বিস্তৃতি, উৎপাদনশীলতা ও প্রযুক্তি প্রয়োগের পর্যায় বিবেচনা করে মাছ ও চিংড়িচাষ উন্নয়নের জন্য লাগসই ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি প্রয়োগ করে উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। জলমহাল নীতিমালা পরিবর্তনপূর্বক মুক্ত জলাশয়ে রাজস্বভিত্তিক ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে উৎপাদন পরিকল্পনাভিত্তিক জৈবিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করাও এখন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সর্বোপরি মাছ ও চিংড়িসহ অন্যান্য জলজ সম্পদের স্থায়িত্বশীল উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সাধন মৎস্য সেক্টরের উন্নয়ন পরিকল্পনার মৌলিক কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০৬ শ্রাবণ ১৪১৭
২১ জুলাই ২০১০

বাণী

মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১০ উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও সুখী সমৃদ্ধশালী জাতি গঠনে মৎস্যসম্পদ আবহমানকাল ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণের পাশাপাশি দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জনেও মৎস্যসম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

রোগ-ব্যাধিমুক্ত জীবনের জন্য আমাদের খাদ্যে যে পুষ্টি উপাদানগুলো অপরিহার্য তার বেশির ভাগই মাছে বিদ্যমান। মাছের আমিষ মানুষের দৈহিক বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ ও মেধা বিকাশে কার্যকর ভূমিকা রাখে যা সুস্থ জাতি গঠনে সহায়ক।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে তথা বিজ্ঞানমনস্ক নিষ্ঠাবান মেধাসম্পন্ন জাতি গঠনের লক্ষ্যে খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র্য বিমোচন, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্য খাতের গুরুত্বপূর্ণ অবদান অনস্বীকার্য।

ভিশন ২০২১ এর আলোকে লাগসই ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সকলস্তরের জনগণের খাদ্য নিরাপত্তায় আমিষের যোগান বৃদ্ধিতে মৎস্য খাত টেকসই ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

'মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি কর, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত কর' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১০ এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা
০৬ শ্রাবণ ১৪১৭
২১ জুলাই ২০১০

বাণী

দেশের সামগ্রিক অগ্রগতি, সমৃদ্ধি, জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা, আমিষের যোগান ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং জলজ পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে মৎস্য সম্পদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামীণ জনগোষ্ঠী তাদের জীবন ও জীবিকা নির্বাহ এবং প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য আদিকাল হতে প্রাকৃতিক জলাভূমিতে উৎপাদিত দেশীয় প্রজাতির মাছের উপর নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট নানাবিধ কারণে মাছের আবাসস্থলের অবক্ষয় ও পরিবেশগত পরিবর্তনে তাদের বংশবিস্তার ও উৎপাদন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। সে প্রেক্ষিতে দেশীয় প্রজাতির মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার আন্তরিকভাবে সচেষ্ট।

সম্ভাবনাময় মৎস্য সম্পদকে কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনীতিকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনাকে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেয়ার জন্য বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। মৎস্য খাতের প্রবৃদ্ধির গতিধারা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি করতে হলে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

দেশের মৎস্য সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহায়তায় মৎস্য অধিদপ্তর ২১-২৭ জুলাই ২০১০ সপ্তাহব্যাপী জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১০ উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে। খাদ্য নিরাপত্তা ও আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবারের প্রতিপাদ্য "মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি কর, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত কর" কে সামনে রেখে বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুত দিন বদলের স্বপ্ন'কে বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে সকলকে একাত্ম হয়ে কাজ করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে গৃহীত প্রতিটি কর্মসূচির সাফল্য প্রত্যাশা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হউক

মোঃ আব্দুল লতিফ বিশ্বাস,এমপি

সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।
০৬ শ্রাবণ ১৪১৭
২১ জুলাই ২০১০

বাণী

মাছ আমাদের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের অংশ। এক সময় পুকুর-ডোবা, খাল-বিল, নদী-নালায় ছিল মাছের প্রাচুর্য। তখন মাছচাষের বিষয়টি ছিল একবারেই গৌণ কিন্তু কালের বিবর্তনে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে একদিকে যেমন বেড়েছে মাছের ব্যাপক চাহিদা , তেমনি প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট কারণে জলজ পরিবেশের ঘটেছে ব্যাপক বিপর্যয়। ফলে মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পাচ্ছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মাছের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। দিনে দিনে মাছচাষ ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হচ্ছে। মৎস্য সাব-সেক্টর কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন, প্রাণিজ আমিষ সরবরাহ এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে। অনেকাংশেই সুদৃঢ় হয়েছে দেশের আপামর জনসাধারণের পুষ্টি নিরাপত্তার বিষয়টি, যা প্রকারান্তরে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা বলয়কে সম্প্রসারিত করেছে।

সম্ভাবনাময় এ খাতের বিস্তৃত ক্ষেত্র ও সম্পদকে কাজে লাগিয়ে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনাকে একটি আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সরকার এ খাতের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। এ খাতের প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি করতে হলে এ খাতের উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ অপরিহার্য। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে আগামী ২১ থেকে ২৭ জুলাই ২০১০ দেশব্যাপী জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১০ পালিত হতে যাচ্ছে। এবারের মৎস্য সপ্তাহের মূল প্রতিপাদ্য "মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি কর, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত কর" যা অত্যন্ত সময়োপযোগী। সকলের কার্যকর অংশগ্রহণ জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১০ তথা মৎস্য সেক্টরের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি।

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১০ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ শরফুল আলম

সৌজন্যে ঃ USAID আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে
নিসর্গ নেটওয়ার্ক